

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রায়হানা সুলতানা

রোলঃ 23090120874

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রায়হানা সুলতানা

রোলঃ 23090120874

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রায়হানা সুলতানা, আইডিঃ 23090120874 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারায়াত কারীম

এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ প্রযুক্তির ফাঁদ ও তার অপকারিতা সমূহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

রায়হানা সুলতানা

আইডিঃ 23090120874

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১	6
ভূমিকা	6
১.১: গবেষণার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য:	6
১.২: গবেষণার সীমাবদ্ধতা	6
১.৩: গবেষণার পদ্ধতি:	7
অধ্যায় ২	8
প্রযুক্তির সংজ্ঞা ও ইতিহাস	8
২.১: প্রযুক্তি কি	8
২.২: প্রযুক্তির বিকাশের ধারা	8
অধ্যায় ৩	10
ইসলাম ও প্রযুক্তি	10
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :	12
অধ্যায় ৪	15
৪.১ শিক্ষা খাতে অবদান	15
৪.৩ ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের বিশেষ সুযোগ	16
৪.৩ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে অবদান	18
৪.৪ চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তির অবদান	19
৪.৫ যোগাযোগ ও ব্যবসায় প্রযুক্তির সুবিধা:	21
অধ্যায় ৫	22
প্রযুক্তির ফাঁদ ও নেতিবাচক প্রভাব	23
৫.১ ব্যক্তিগত জীবনে প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব:	27
৫.২ সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব	29
৫.৩ শিশু ও কিশোরদের ওপর প্রভাব	29

৫.৪ অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ও মানসিক সমস্যা	33
অধ্যায় ৬	34
প্রযুক্তি ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ ও সমাধান.....	35
৬.১: সচেতন ব্যবহার	35
৬.২ নৈতিক দিকনির্দেশনা	36
৬.৩ পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা.....	36
অধ্যায় ৭.....	41
উপসংহার ও সুপারিশ	41
৭.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ	41
৭.২ মূল সিদ্ধান্ত	43

লেখিকার কথা

আলহামদুলিল্লাহ্। সর্বাত্মে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুকরিয়া এবং কৃতজ্ঞতা জানাই মহান রব্বুল 'আলামিনের প্রতি যিনি এই অধম বান্দিকে তার দ্বীনের খেদমতের এই অংশে যুক্ত করেছেন। তারপর শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জানাই 'ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা'র কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক বৃন্দ এবং এর সাথে দায়িত্বশীল সবার প্রতি, কারণ এই প্ল্যাটফর্ম ছাড়া আমি দ্বীনের খেদমতের এই অংশে যুক্ত হতে পারতাম না এবং দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেতাম না।

অশেষ শুকরিয়া এবং কৃতজ্ঞতা আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদজীর প্রতি, যাঁর দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও উৎসাহ ছাড়া এই কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। পাশাপাশি আমার পরিবারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁরা সর্বদা আমাকে মানসিক ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছেন।

আমি জানি, গবেষণাটিতে সীমাবদ্ধতা থাকবে। তাই ভবিষ্যতে গবেষণাটিকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য বিজ্ঞ পাঠকদের যেকোনো গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ আমি সাদরে গ্রহণ করবো, ইনশাআল্লাহ্।

وما توفى الا بالله

অধ্যায় ১

ভূমিকা

১.১: গবেষণার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য:

আধুনিক যুগে প্রযুক্তি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ আজ সহজে যোগাযোগ করছে, তথ্য সংগ্রহ করছে এবং জীবনযাত্রা উন্নত করছে। কিন্তু একইসাথে প্রযুক্তির কিছু নেতিবাচক প্রভাবও আমাদের সমাজে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে। অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং নৈতিক অবক্ষয়সহ নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে প্রযুক্তির অপব্যবহার থেকে।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রযুক্তির ফাঁদগুলিকে চিহ্নিত করা এবং তার অপকারিতা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে কিভাবে প্রভাব ফেলছে তা বিশ্লেষণ করা। আশা করি, এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রথমে আমার নিজের এবং পরবর্তীতে পাঠকদের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে সহায়ক হবে।

১.২: গবেষণার সীমাবদ্ধতা

যে কোনো গবেষণার মতো এ গবেষণারও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, গবেষণায় সময় ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে গেছে। ফলে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অভিজ্ঞতা ও মতামত সমানভাবে প্রতিফলিত করা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত, এই গবেষণার জন্য ব্যবহৃত তথ্যগুলো মূলত বিভিন্ন অনলাইন ভিত্তিক গ্রন্থ/প্রবন্ধ, সংবাদপত্র ও অন্যান্য তথ্য ভান্ডারের উপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পক্ষপাত গবেষণার ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে।

তৃতীয়ত, প্রযুক্তি একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র। প্রতিদিন নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে এবং তার প্রভাব সমাজে পরিবর্তন আনছে। তাই গবেষণার ফলাফল সময়ের সাথে আংশিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়তে পারে।

এ সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, গবেষণাটি প্রযুক্তির ফাঁদ ও এর অপকারিতা সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ্ প্রাথমিক ধারণা প্রদান করবে এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

১.৩: গবেষণার পদ্ধতি:

এই গবেষণার তথ্যগুলো মূলত অনলাইন থেকে বিভিন্ন বই, সংবাদপত্র, কয়েকজন সম্মানিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির লেকচার এবং অন্যান্য তথ্য ভান্ডার থেকে সংগ্রহ করে কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অধ্যায় ২

প্রযুক্তির সংজ্ঞা ও ইতিহাস

২.১: প্রযুক্তি কি

মানুষ স্বভাবতই কৌশলী এবং গবেষণা প্রিয়। তাই যে কোন লক্ষ্য অর্জনে মানুষ প্রতিনিয়তই চেষ্টা করে যাচ্ছে। নিজেদের জীবনধারা উন্নত করার ও সহজ করার জন্য বিভিন্ন কৌশল, দক্ষতা ও পদ্ধতি এক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হয়। কাজকে সহজীকরণের জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার করা হয় তাই প্রযুক্তি। মূলত আল্লাহর দেয়া জ্ঞান এবং সৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বিভিন্ন জিনিস উদ্ভাবন করে।

এক কথায় বলা যায়, মানুষ তার জীবনের মানোন্নয়ন বা তার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ কে যে পদ্ধতিতে পরিবর্তন করে নতুন রূপ দেয়,তাকেই প্রযুক্তি বলে।

২.২: প্রযুক্তির বিকাশের ধারা

প্রযুক্তির বিকাশ হলো মানুষের প্রয়োজন মেটানো ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নতুন সরঞ্জাম, কৌশল এবং পদ্ধতি আবিষ্কারের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা সাধারণ

পাথরের সরঞ্জাম থেকে শুরু করে আধুনিক কম্পিউটার ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিকাশ মানুষের যোগাযোগ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং জীবনকে সহজ ও দক্ষ করে তুলেছে।

সাধারণত আমরা যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করে থাকি।

প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। সংক্ষেপে এই তিনটি যুগে প্রযুক্তির অবস্থা দেখে নেয়া যাক।

প্রাচীন যুগ: প্রযুক্তির ইতিহাস মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই শুরু। যেমন: প্রাচীন কালের মানুষ শিকার, সংগ্রহ এবং আশ্রয় তৈরির জন্য পাথর, কাঠ এবং হাড় দিয়ে তৈরি সহজ হাতিয়ার ব্যবহার করত। এই সময়ে তৈরি হওয়া উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে পাথরের হাতিয়ার, চাকা, লাঙল, কোদাল, কাস্তে এবং পিরামিড নির্মাণের মতো স্থাপত্য কৌশল।

মধ্য যুগ: এই যুগে বিশেষ করে ইউরোপে, বারুদ, চশমা, যান্ত্রিক ঘড়ি, এবং মুদ্রণ যন্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন হয়েছিল, যা কৃষি, নির্মাণ ও সামরিক ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন আনে।

আধুনিক যুগ: ১৭শ এবং ১৮শ শতাব্দীতে সংঘটিত শিল্প বিপ্লব আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপন করে, যা বর্তমান পর্যন্ত বিদ্যমান।

আধুনিক যুগে প্রযুক্তি মানব জীবনকে অপরিহার্যভাবে প্রভাবিত করেছে, যা যোগাযোগ, পরিবহন, কৃষি এবং দৈনন্দিন কাজকে সহজ ও দ্রুত করে তুলেছে। কম্পিউটার, কৃত্রিম উপগ্রহ, ব্যক্তিগত গাড়ি এবং স্বয়ংক্রিয় মেশিন সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হয়েছে এই সময়ে এবং আরও অনেক নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন চলমান রয়েছে।

অধ্যায় ৩

ইসলাম ও প্রযুক্তি

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এটা শুধু আত্মার চর্চা নয় বরং এটা বিজ্ঞানেরও পথপ্রদর্শক।

আল্লাহ্ কুরআনের এই আয়াতটি সর্বপ্রথম নাযিল করেছেন।

افْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ-

“পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন”(সূরা আল-আলাক, আয়াত -১)

এই আয়াতের মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায় যে, জ্ঞানার্জন ও অনুসন্ধান করা আল্লাহর আদেশ।

ইসলাম সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তারা মনে করে, ইসলাম এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরস্পর বিরোধী। অথচ বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি কোনো ধর্মবিরোধী বিষয় নয়, বরং তা জ্ঞানের একটি ফল। ইসলাম সবসময়ই প্রযুক্তির পক্ষে এবং এর উন্নতির পক্ষে। তবে এর ব্যবহার হতে হবে পরিমিত।

দুনিয়াতে যা কিছু আমরা মানুষের আবিষ্কার বলে মনে করি সেগুলিও মূলতঃ আল্লাহ তা‘আলারই সৃষ্টি। কারণ তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনিই কালের স্রষ্টা, কালের সব নবাবিষ্কারও তাঁরই সৃষ্টির সহায়তায় সৃষ্ট। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ‘তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু’ (সূরা বাক্বারাহ, আয়াত ২৯)। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে যত সব আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট।

প্রত্যেকটি কাজেরই একটি ভাল দিক এবং একটি খারাপ দিক থাকে। যেমন একটা উদাহরণ দেয়া যায়- প্রত্যেক বাসা বাড়িতে ধারালো কিছু জিনিস থাকে,

যেমন ছুরি-দা/বটি ইত্যাদি। এগুলো ব্যবহার করে আমরা মাছ, মাংস, ফলমূল কেটে থাকি। অর্থাৎ দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করে থাকি। এসব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এগুলো খুবই উপকারী। কিন্তু এসব ধারালো জিনিস যদি কেউ আত্মহত্যা বা অন্যকে আক্রমণ করতে বা কোন ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করে, তাহলে কি সেটা উপকারী হবে? নিশ্চয়ই না। ইসলামও সর্বক্ষেত্রে সেটাই বলে, প্রযুক্তির উপকারী দিক গ্রহণ করতে বলে এবং অপকারী বা ক্ষতিকর দিক বর্জন করতে বলে।

সব নবী-রাসূলই তাদের যুগে তৎকালীন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রচার-প্রসার করেছেন। উম্মতকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শিখিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন।

মূসা (আঃ)-এর সময় জাদুর প্রভাব ছিল অধিক। মূসা (আঃ) সে যুগের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ প্রদত্ত মুজেযা ব্যবহার করে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। ফলে অসংখ্য জাদুকর আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।

ঈসা (আঃ)-এর সময়ে চিকিৎসাবিদ্যার প্রচলন ছিল বেশী। তিনি তাই আল্লাহ প্রদত্ত চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াত দিয়েছেন। মৃতকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করে দেখানোর মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করেছেন।

নবী সুলাইমান (আঃ) এর সময়ের প্রযুক্তি ছিল অলৌকিক এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল, যেখানে তিনি বাতাস এবং জ্বীনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। তিনি বাতাসকে চালিত করতে পারতেন, যা তার সিংহাসনের সাথে যুক্ত ছিল, এবং জিনদের ব্যবহার করে বিশাল নির্মাণ যেমন গলিত পিতল/তামা থেকে বর্ণা বা বিভিন্ন নির্মাণ কাজ করাতে পারতেন। তার রাজত্বকালে, এই ঐশ্বরিক প্রযুক্তিগুলি নির্মাণ, যোগাযোগ এবং শাসনকে সহজতর করতো।

নবী নূহ (আ.)-এর সময়কার প্রযুক্তি মূলত ছিল নৌকা নির্মাণ। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে একটি বিশাল নৌকা তৈরির নির্দেশ দেন, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত ও নির্মাণ প্রকৌশল-সম্পর্কিত কাজ ছিল। এই নৌকাটি ছিল গফার কাঠ দিয়ে তৈরি, যার উপর পিচ লাগানো ছিল এবং এর তিনটি ডেক ছিল। এটি ছিল সেই সময়ের একটি যুগান্তকারী প্রযুক্তি, যা প্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (صلی اللہ علیہ وسلم)-কে আল্লাহ সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এ ধরনীতে এসে মুশরিক, ইহুদী সহ সবাইকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াত দানে তিনি তৎকালীন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। ছাফা পাহাড়ে উঠে তিনি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। সে যুগে সাহিত্যের প্রভাব ছিল বেশী। তিনি উচ্চাঙ্গের আরবী সাহিত্যের ব্যবহার করেও মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে ইসলামি স্বর্ণযুগের সূচনা হয়, যেখানে অনেক মুসলিম বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

এভাবে যুগে যুগে প্রযুক্তির ব্যবহার আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে আসছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি :

ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ বলেন,
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ
- ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُوَفِّي مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
‘তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু
হতে, অতঃপর জমাট রক্ত হতে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করে দেন শিশুরূপে।
অতঃপর তোমরা পৌঁছে যাও যৌবনে। অতঃপর বার্ধক্যে। তোমাদের কারু কারু
এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং কেউ কেউ নির্ধারিত আয়ুষ্কাল পর্যন্ত পৌঁছে যাও।
যাতে তোমরা অনুধাবন কর।’ (গাফির/মুমিন ৪০/৬৭)।

এই আয়াতটির মধ্যে যে বিপুল পরিমাণের বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং চিন্তার খোরাক
আছে তা যদি বাদও দেই, শুধু আয়াতের সমাপ্তিটি ‘যাতে তোমরা অনুধাবন কর’
এটুকু লক্ষ্য করি, তাহ’লে দেখতে পাব যে, কিভাবে মানুষ মাত্র একফোঁটা তরল
পানি থেকে পূর্ণাঙ্গ শিশু হয়ে বের হয়ে একসময় বড় হয়ে শক্ত-সমর্থ মানুষে
পরিণত হয়, তারপর একদিন বৃদ্ধ হয়ে মারা
যায়। ঠিক একইভাবে বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করাটাও মানুষ হবার একটি
অত্যাবশ্যকীয় অংশ।

এই আয়াতের মমার্থ উপলব্ধি করে, যুগে যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানের চর্চা
করেন এবং সেই মধ্যযুগে জ্ঞানের আলো সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।
তৎকালীন সময়ে ইউরোপ ছিল অজপাড়াগাঁ। আর মুসলিম স্পেন ছিল প্রযুক্তির
ব্যবহারে শীর্ষে। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবক। যেমন
রসায়ন, চিকিৎসা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির উদ্ভাবক ছিলেন
মুসলিম বিজ্ঞানীগণই। রসায়ন বিজ্ঞানের জনক জাবির বিন হাইয়ান, চিকিৎসা
বিজ্ঞানে আল-রাযী ও ইবনে সীনা, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানে আল-ফারগানী,
সমাজবিজ্ঞানে ইবনে খালদুন প্রমুখের নাম জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আকল বা বিচার-বুদ্ধি ও ফিকর বা চিন্তা-চেতনার
গুরুত্ব অত্যধিক। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের নির্দেশনা এসেছে যে, **وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا**

فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (সূরা আর রুম/আয়াত ৮)

অর্থ “তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও
এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য,
কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী”

ইসলাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে কখনই নিরুৎসাহিত করে না। বরং এর
সঠিক ও সুন্দর ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। মদীনায় নবী করীম (صلی الله علیه)
(و سلم)-এর জীবনে এরকম অনেক প্রযুক্তিগত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আহযাব
বা খন্দকের যুদ্ধে যে পারসিক কৌশল ব্যবহার করা হয়, তা ছিল আরবদের কাছে
অপ্রচলিত প্রযুক্তি। এমনভাবে অন্য যুদ্ধগুলোতেও সামরিক দিক দিয়ে অনেক
উন্নত রণকৌশলের প্রয়োগ দেখা যায়। ইসলামী সমাজের বিভিন্ন নীতিমালা যে
কতটা বিজ্ঞানসম্মত তা আজ সুপ্রমাণিত। মহানবী (صلی الله علیه وسلم)-এর
প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূলনীতি ছিল সর্বাধুনিক ও সর্বকালীন।

তবে প্রতিটি জিনিসেরই ভালো-খারাপ দিক রয়েছে। মানুষ চাইলে তাকে যে কোন
পথে ব্যবহার করতে পারে। প্রযুক্তিও তার ব্যতিক্রম নয়। এটিকে যেমন ইসলামের
খেদমতে ব্যবহার করা সম্ভব। তেমনি খারাপ পথেও তা ব্যবহার করা যায়।
লক্ষণীয় যে, আমরা প্রযুক্তিকে কোন্ কাজে ব্যবহার করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়।
আমরা যদি প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচার এবং বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে লাগাই,
তাহলে সব ধরনের প্রযুক্তিই নেয়ামতে পরিণত হবে।

অধ্যায় ৪

প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রভাব

৪.১ শিক্ষা খাতে অবদান

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষাকে আরও কার্যকর, উপভোগ্য ও সহজলভ্য করে তুলতে সাহায্য করে। শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহারের কয়েকটি উপায় নিম্নরূপ:

- শিক্ষা উপকরণ ও সামগ্রী তৈরিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ই-বুক, ভিডিও, অ্যানিমেশন, মাল্টিমিডিয়া উপকরণ ইত্যাদি তৈরিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। এসব উপকরণ শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে তোলে।
- শিক্ষা কার্যক্রমে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কম্পিউটার, প্রজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইত্যাদি ব্যবহার করে পাঠদান করা যায়। এছাড়াও, শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা যায়।
- শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা যায়। এতে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব গতিতে ও সুবিধামতো পড়াশোনা করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য অনুশীলন ও মূল্যায়নমূলক কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, অনলাইন কুইজ, পরীক্ষা, গেমস ইত্যাদি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষতা বিকাশে সাহায্য করা যায়।
- শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। এতে শিক্ষকরা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নত করতে পারেন।

তবে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেমন, প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়াও, প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

৪.৩ ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের বিশেষ সুযোগ

পবিত্র কোরআনে এসেছে- **الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** অর্থ “তিনিই সে সত্ত্বা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত”(সূরা বাক্বারা-আয়াত ২৯)। এই আয়াত থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিগত যত উন্নয়ন ও উৎকর্ষ, সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত।

বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রযুক্তির যুগ। বিভিন্ন প্রযুক্তির আবিষ্কার আসলে আল্লাহর নেয়ামতেরই আরেকটি দিক। এর কল্যাণে গোটা বিশ্বই এখন একটি অভিন্ন নগরীতে পরিণত হয়েছে। মুহূর্তেই এক দেশের খবর চলে আসে অন্য দেশে। হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থানরত মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায় অনায়াসে। এমন কোনো প্রযুক্তি-পণ্য নেই, যেটা ইসলামের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় না। কারণ ইসলামে হারামের পরিমাণ কম, হালালের পরিমাণ বেশি। ইসলামী শরিয়তের একটি মূলনীতি হচ্ছে- ‘মৌলিকভাবে প্রতিটি বস্তু হালাল। যদি না তার নেতিবাচক দিকগুলো প্রমাণিত হয়।’ (কাওয়ায়িদুল ফিকহিয়া লিল-মুবতাদি, পৃষ্ঠা ৬৮)। অর্থাৎ কোনো একটা জিনিস সামনে আসলে প্রথমে ধরে নিতে হবে বিষয়টা মূলগতভাবে বৈধ। তারপর যদি তাতে অবৈধ হওয়ার কারণ পাওয়া যায়, তখন সে কারণের ভিত্তিতে সেটাকে অবৈধ বলা হবে। এ মূলনীতির আলোকে নির্দিধায় বলা যায়, ইসলামে প্রযুক্তির ব্যবহার অবৈধ নয়; বরং সমকালীন ইসলামিক স্কলাররা প্রযুক্তির ব্যবহারকে ইতিবাচক হিসেবেই গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে এর নানা উপাদান-উপকরণ ব্যবহার করছেন। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমাকে যা উপকৃত করবে সে ব্যাপারে তুমি ধাবিত হও এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করো। নিরাশ হয়ো না।’ (মুসলিম : হাদিস ২৬৬৪)।

তাই বলা যায়, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে প্রযুক্তির ব্যবহার কোনোভাবেই ইসলামে অবৈধ বলার সুযোগ নেই।

ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর মানুষ এখন এক ও অভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে বসবাস করছে।

বিগত প্রায় এক দশকে অনলাইনে শিক্ষার বিভিন্ন ধারার পাশাপাশি অনলাইন ইসলামিক মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছে। এতে এক দেশের ইসলামিক স্কলারের কাছে অন্য দেশের শিক্ষার্থীরাও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। শিক্ষার্থীরা গুগল মিট, জুম ইত্যাদি ব্যবহার করে কোরআন-হাদিস, মাসআলা-মাসায়েল শিখছে, বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স করছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের জীবন যেমন সহজ ও সুন্দর হয়েছে, তেমনি পরকালীন পাথেয় সংগ্রহেরও সুপ্রশস্ত রাস্তা তৈরি হয়েছে।

ইসলামে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মীয় এ বোধ থেকেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ইসলামিক বিভিন্ন অনলাইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ডিজিটাল ডিভাইসের অন্যান্য অনুষঙ্গ। এখন মানুষের হাতের মুঠোয় জ্ঞানার্জনের অফুরন্ত সুযোগ। অনলাইনে খুব সহজেই কোরআন-হাদিসের বাণীগুলো পড়া ও সার্চ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কোরআন-হাদিসের এই সঙ্কলনগুলো বাংলায় সহজলভ্য। সহজেই নামাজে সময়সূচি, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত প্রভৃতি জানা যায়। স্মার্টফোনের মাধ্যমে ইসলামী লেকচার,, অডিও-ভিডিও শোনা ও দেখা যায়। ইসলাম বিষয়ক অ্যাপগুলোতে কোরআনের বিভিন্ন অনুবাদ, হাদিসের গ্রন্থ, ফাতওয়ার কিতাব, নামাজের সময়সূচি, দৈনন্দিন জীবনের দোয়া, তাফসির, মাসআলা-মাসায়েল প্রভৃতি বিষয় রয়েছে। বিভিন্ন কাজের ফাঁকে, ভ্রমণে ও অবসর সময়ে এক ক্লিকেই এসব পড়া যায়। শুধু পড়াই নয়, অডিও ডাউনলোডের মাধ্যমে বিখ্যাত কারিদের তেলাওয়াত শোনা এখন অনেক সহজ হয়েছে। আগে কোরআনের আয়াত বা হাদিসের ইবারত সংগ্রহ করা অনেক কঠিন ছিল। কিন্তু এখন অনেক সহজ। কোরআন-হাদিস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সফটওয়্যার

রয়েছে। এগুলোতে সহজেই একটি সূরা থেকে অন্য সূরায় গমন করা যায়। বিভিন্ন আয়াত বের করা যায়, বিভিন্ন শব্দ দিয়েও আয়াত বের করা যায়। এ ছাড়া ইসলাম বিষয়ক অসংখ্য ওয়েবসাইট মানুষের জ্ঞানপিপাসা নিবারণে কাজ করছে। অনেক সময় পড়া ও শোনার চেয়ে চোখে দেখা বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে ইউটিউব, ফেসবুক লাইভ অনেক বড় ভূমিকা রাখছে। অস্বীকারের সুযোগ নেই, তথ্য ও প্রযুক্তি ইসলামী জ্ঞানের বিকাশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। অনেকেই আমরা ছোটবেলায় মাদ্রাসার সংস্পর্শ পাইনি। তাই ইসলামিক জ্ঞান আহরণেরও সুযোগ হয়নি। কিন্তু একসময় আল্লাহর অশেষ রহমতে এই প্রযুক্তির মাধ্যমেই আমরা ইসলামিক জ্ঞান সহজে অর্জন করতে পারছি। এটা আমাদের উপর আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত ছাড়া আর কি?

ইসলাম মানুষের জন্য যেকোনো কল্যাণকর জিনিসের সঠিক ব্যবহার অনুমোদন করে। তাই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে ইসলামের কোনো আপত্তি নেই।

৪.৩ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে অবদান

বর্তমান টেকনোলজি বা প্রযুক্তি ব্যবসা, শিক্ষা স্তর বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মান উন্নত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও এর অবদান অপরিহার্য। উন্নত প্রযুক্তি স্বাস্থ্যসেবায় বিশ্বব্যাপী অগণিত মানুষের জীবন বাঁচিয়ে তুলেছে এবং জীবনের গুণগত মান উন্নত করে তুলেছে।

স্বাস্থ্য সেবায় প্রযুক্তি শুধুমাত্র রোগী বা তাদের পরিবারের অভিজ্ঞতা পরিবর্তন করেনি। উপরন্তু তার পাশাপাশি চিকিৎসার পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের চর্চার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

এক্স-রে মেশিন থেকে সার্জারি, প্রযুক্তি আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত এবং জীবনে প্রত্যাশার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। চলুন দেখে নিই স্বাস্থ্য সেবায় প্রযুক্তি বা টেকনোলজি অবদান-

৪.৪ চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তির অবদান

উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তিটি চিকিৎসকদের, আরও ভালোভাবে রোগীদের চিকিৎসা করার এবং পেশাদারদের অনশীলন করার সুযোগ দেয়।

• চিকিৎসা ও প্রযুক্তিঃ

আজকের পৃথিবীতে প্রযুক্তি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির দান অপরিহার্য।

চিকিৎসা প্রযুক্তি একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। যেখানে বায়োটেকনোলজি, ফার্মাসিউটিক্যালস, তথ্য প্রযুক্তি, উন্নয়ন চিকিৎসার সাজসরঞ্জামগুলি সারা বিশ্বের মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান যে চিকিৎসা প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে তা অস্বীকার করা যায় না। স্বাস্থ্যসেবা অনুশীলনকারীদের রোগ নির্ণয়, সার্জারি প্রক্রিয়া, রোগীদের যত্ন থেকে অনুশীলন আরও উন্নত করার উপায় তাদের খুঁজে বার করতে হবে।

• স্বাস্থ্য সেবায় তথ্য প্রযুক্তিঃ

বর্তমানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য প্রযুক্তির সার্থক অবদান রয়েছে। যেমন- চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই তথ্য প্রযুক্তিগুলি ইলেকট্রনিক মেডিক্যাল রেকর্ড, টেলিহেলথ সার্ভিস, মোবাইল টেকনোলজি (যেমন – ট্যাবলেট, স্মার্ট ফোন ইত্যাদি) ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে। দিনের পর দিন চিকিৎসক ও রোগীদের জন্য মেডিক্যাল টেকনোলজি আরও সুবিধা আনছে। নিচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো:

টেলিযোগাযোগঃ-

হাজার হাজার মাইল দূর থেকে টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে রোগীদের সঙ্গে ডাক্তারদের সংযোগ স্থাপন করে তোলে প্রযুক্তি। চিকিৎসকের সঙ্গে রোগীদের ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলে সমস্যা সমাধান করা, আজকের পৃথিবীতে অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এতে সময় অপচয় কম হয় বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে চিকিৎসা করানোর জন্য টাকা খরচও কম হয়। স্বাস্থ্য সেবার প্রযুক্তি

মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন স্থানে বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তারকে দ্রুত স্বাস্থ্য তথ্য পাঠানো সম্ভব।

মোবাইল ডিভাইসঃ-

সেকেন্ডের মধ্যে চিকিৎসা প্রযুক্তির (যেমন – মোবাইল) মাধ্যমে তাদের কাজ সম্পাদন করতে পারে। চিকিৎসকরা এখন

মুহূর্তের মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারেন। যেমন – ড্রাগ ইনফরমেশন, গবেষণা সম্বন্ধিত তথ্য, রোগীদের তথ্যের রেকর্ড ইত্যাদি।

মোবাইল ডিভাইস প্রযুক্তির মাধ্যমে চিকিৎসকরা তাদের যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্বের যে কোন স্থানে বহন করে নিয়ে যেতে পারে।

• প্রযুক্তি ও চিকিৎসা গবেষণাঃ

চিকিৎসক এবং চিকিৎসা গবেষণা রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময়ের পাশাপাশি নতুনত্ব ঔষধ তৈরিতে অনবরত পরীক্ষা করে চলেছে।

চিকিৎসা গবেষণা প্রযুক্তি ব্যবহার করে, বিজ্ঞানীরা সেলুলার স্তরে রোগ নির্ণয় এবং রোগের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম হচ্ছেন। স্বাস্থ্য সেবায় প্রযুক্তি ম্যালেরিয়া, পোলিও, এম এম আর মতো জীবন বিপন্ন রোগগুলি বিরুদ্ধে টিকা আবিষ্কার করে বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গণনা করে দেখেছে, প্রতি বছর এই টিকাগুলি প্রায় ৩ মিলিয়নের বেশি প্রাণ বাঁচায় এবং লাখ লাখ মানুষকে মারাত্মক ভাইরাস রোগের সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচায়।

• চিকিৎসা প্রযুক্তির সরঞ্জামঃ

জীবনের মান উন্নত করার একটি সুবিধা হল চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন মাত্রা আনা। সার্জারি, ভালো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং আরামদায়ক স্ক্যানিং সাজসরঞ্জামগুলি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে ও সুস্থ জীবন উপভোগ করতে সুযোগ দেয়।

চিকিৎসা সাজসরঞ্জাম প্রযুক্তি এবং টেলিহেলথ রোবোটিক সার্জারি সৃষ্টি করছে, যেখানে কিছু কেসে সার্জারি চলার সময় চিকিৎসককে রোগীর সঙ্গে অপারেটিং

রুমে থাকার প্রয়োজন হবে না। তার পরিবর্তে সার্জন তাদের ‘ হোম বেস ‘ থেকে কাজ করতে পারে এবং রোগীরা তাদের নিজস্ব শহরের কাছাকাছি যে কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে কার্যপ্রণালী সম্পাদন করতে পারে।

৪.৫ যোগাযোগ ও ব্যবসায় প্রযুক্তির সুবিধা:

যোগাযোগ ও ব্যবসায় প্রযুক্তির সুবিধাগুলো হলো দ্রুত এবং উন্নত যোগাযোগ, খরচ কমানো, দক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের সুবিধা, এবং নতুন ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি। এই প্রযুক্তিগুলি ব্যবসার প্রক্রিয়াকে সহজ করে, কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, এবং গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদান করে, যা সামগ্রিকভাবে ব্যবসাকে আরও দক্ষ ও লাভজনক করে তোলে।

যোগাযোগ সুবিধা:

দ্রুত এবং কার্যকর যোগাযোগ: ইমেইল, ভিডিও কনফারেন্সিং এবং ইনস্ট্যান্ট মেসেজিংয়ের মতো প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

সমন্বয় বৃদ্ধি: বিভিন্ন বিভাগ এবং কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় সহজ হয়, যা প্রজেক্ট পরিচালনাকে আরও কার্যকর করে তোলে।

ব্যবসায়িক সুবিধা:

দক্ষতা বৃদ্ধি: প্রযুক্তি কর্মীদের আরও দক্ষতার সাথে কাজ করতে সহায়তা করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং কর্মপ্রবাহকে সহজ করে তোলে।

খরচ হ্রাস: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) সময় ও শ্রমের অপচয় কমিয়ে ব্যবসার খরচ কমাতে সাহায্য করে।

অনলাইন ব্যবসার সুযোগ: ইন্টারনেট এবং ই-কমার্স ব্যবসা সম্প্রসারণের নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, যা ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা দূর করে।

গ্রাহক সেবা উন্নয়ন: উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের দ্রুত এবং কার্যকর সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়।

তথ্য ব্যবস্থাপনা: ডেটা সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়, যা ব্যবসার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

কায়িক শ্রম হ্রাস: অনেক কাজ স্বয়ংক্রিয় করা যায়, যা কায়িক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে।

অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রের মতো প্রযুক্তির প্রয়োগ ব্যবসা-বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করেছে। যেকোনো ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য থাকে কম সময়ে এবং কম খরচে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করা এবং দ্রুততম সময়ে তা ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া, যা এখন খুব সহজেই প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়।

অধ্যায় ৫

প্রযুক্তির ফাঁদ ও নেতিবাচক প্রভাব

মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনযাপনকে সহজ ও সাবলীল করেছে। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে সঠিক ব্যবহার ও এর সুফল আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির অপব্যবহারে অনেকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। এর কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

প্রযুক্তির ফাঁদ ও নেতিবাচক বিষয়গুলো এখানে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হলো:

মানুষের সৃষ্টি থেকেই জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। আদি পিতা আদম (আ.)-এর সৃষ্টির সময় ফেরেশতারা ইবাদতে মশগুল থাকতেন, তবুও তার সৃষ্টির কারণ হিসেবে আল্লাহ জ্ঞানের কথা বলেছেন। যুগে যুগে সব নবী-রাসুলকে আল্লাহ ঐশীজ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন। এ ধারায় সর্বশেষ আসমানি কিতাব পবিত্র কোরআন। এটি মানবজাতির যাপিত জীবনের সংবিধান। কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ যত প্রকার নতুনত্বের সম্মুখীন হবে, প্রতিটি বিষয়ের সমাধান ও পথনির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহে মৌলিকভাবে বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন,

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“আমি এই কিতাবে কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে।” (সূরা আনআম : ৩৮)।

এ আয়াত থেকে বুঝতে পারি, আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও ডিজিটাল মাধ্যমের জিজ্ঞাসাও মুসলমানরা পবিত্র কুরআন থেকে আহরণ করতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তিকেও ইসলামী শিক্ষা আহরণ ও বিতরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব।

পবিত্র কোরআনে এসেছে,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অবহিত।”(সূরা বাকারা /আয়াত ২৯)

সুতরাং বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিগত যত উন্নয়ন ও উৎকর্ষ, সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত।

এখন তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের যুগ। প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা বিশ্বই এখন একটি অভিন্ন নগরীতে পরিণত হয়েছে। মুহূর্তেই এক দেশের খবর চলে আসে অন্য দেশে। হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থানরত মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায় অনায়াসে। আধুনিক সভ্যতার এই তাবৎ আবিষ্কার, প্রযুক্তির এ উন্নয়ন- সবই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নেয়ামত। এমন কোনো প্রযুক্তি-পণ্য নেই, যেটা ইসলামের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় না। কারণ ইসলামে হারামের পরিমাণ কম, হালালের পরিমাণ বেশি। ইসলামী শরিয়তের একটি মূলনীতি হচ্ছে- ‘মৌলিকভাবে প্রতিটি বস্তু হালাল। যদি না তার নেতিবাচক দিকগুলো প্রমাণিত হয়।’ (কাওয়ায়িদুল ফিকহিয়া লিল-মুবতাদি, পৃষ্ঠা ৬৮)। অর্থাৎ কোনো একটা জিনিস সামনে আসলে প্রথমে ধরে নিতে হবে বিষয়টা মূলগতভাবে বৈধ। তারপর যদি তাতে অবৈধ হওয়ার কারণ পাওয়া যায়, তখন সে কারণের ভিত্তিতে সেটাকে অবৈধ বলা হবে। এ মূলনীতির আলোকে নির্দিধায় বলা যায়, ইসলামে প্রযুক্তির ব্যবহার অবৈধ নয়; বরং সমকালীন ইসলামিক স্কলাররা প্রযুক্তির ব্যবহারকে ইতিবাচক হিসেবেই গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামী শিক্ষার বিস্তারে এর নানা উপাদান-উপকরণ ব্যবহার করছেন। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমাকে যা উপকৃত করবে সে ব্যাপারে তুমি ধাবিত হও এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করো। নিরাশ হয়ো না।’ (মুসলিম : হাদিস ২৬৬৪)। তাই বলা যায়, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে প্রযুক্তির ব্যবহার কোনোভাবেই ইসলামে অবৈধ বলার সুযোগ নেই।

ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর মানুষ এখন এক ও অভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে বসবাস করছে। ব্যাংকিং, মার্কেটিং, জার্নালিজম থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই অনলাইন ভার্শন তৈরি হয়েছে। গড়ে উঠেছে দৃশ্যমান দুনিয়ার পাশাপাশি আরেকটি ভার্চুয়াল দুনিয়া। ফলে অফলাইন ও অনলাইন নামক দুটো পথ এখন পৃথিবীর মানুষের সামনে অব্যাহত। এখন মাল্টিমিডিয়ায় লেখাপড়ার অসংখ্য চমকপ্রদ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ক্লাসের পড়া স্ক্রিনে প্রদর্শন করা যায়, এমনকি পরীক্ষার খাতায় কিছু না লিখে সরাসরি কম্পিউটারে পরীক্ষা দেওয়া যায়। একটা ই-বুক ডিভাইসে শিক্ষার্থীরা শুধু যে তার পাঠ্যবই রাখতে পারে তা নয়, বরং লাইব্রেরির কয়েক হাজার বই পর্যন্ত রাখতে পারে। প্রজেক্টরের মাধ্যমে এক দেশের স্কুলার অন্য দেশের শিক্ষার্থীদের পড়াতে পারেন খুব সহজেই। বিগত প্রায় এক দশকে অনলাইনে শিক্ষার বিভিন্ন ধারার পাশাপাশি অনলাইন ইসলামিক মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছে। এতে এক দেশের ইসলামিক স্কুলারের কাছে অন্য দেশের শিক্ষার্থীরাও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। শিক্ষার্থীরা গুগল মিট, জুম ইত্যাদি ব্যবহার করে কোরআন-হাদিস, মাসআলা-মাসায়েল শিখছে, বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স করছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের জীবন যেমন সহজ ও সুন্দর হয়েছে, তেমনি পরকালীন পাথেয় সংগ্রহেরও সুপ্রশস্ত রাস্তা তৈরি হয়েছে।

ইসলামে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মীয় এ বোধ থেকেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ইসলামিক অনলাইন প্রতিষ্ঠান এবং ডিজিটাল ডিভাইসের অন্যান্য অনুষঙ্গ। এখন মানুষের হাতের মুঠোয় জ্ঞানার্জনের অফুরন্ত সুযোগ। অনলাইনে খুব সহজেই কোরআন-হাদিসের বাণীগুলো পড়া ও সার্চ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কোরআন-হাদিসের এই সঙ্কলনগুলো বাংলায় সহজলভ্য। সহজেই নামাজে সময়সূচি, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত প্রভৃতি জানা যায়। স্মার্টফোনের মাধ্যমে ইসলামী লেকচার, গান, টিউটোরিয়ালের অডিও-ভিডিও শোনা ও দেখা যায়। ইসলাম বিষয়ক অ্যাপগুলোতে কোরআনের বিভিন্ন অনুবাদ, হাদিসের গ্রন্থ, ফাতাওয়ার কিতাব, নামাজের সময়সূচি, দৈনন্দিন জীবনের দোয়া, তাফসির, মাসআলা-মাসায়েল প্রভৃতি বিষয় রয়েছে। বিভিন্ন কাজের ফাঁকে, ভ্রমণে ও অবসর

সময়ে এক ক্লিকেই এসব পড়া যায়। শুধু পড়াই নয়, অডিও ডাউনলোডের মাধ্যমে বিখ্যাত কারিদের তেলাওয়াত শোনা এখন অনেক সহজ হয়েছে। আগে কোরআনের আয়াত বা হাদিসের ইবারত সংগ্রহ করা অনেক কঠিন ছিল। কিন্তু এখন অনেক সহজ। কোরআন-হাদিস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সফটওয়্যার রয়েছে। এগুলোতে সহজেই একটি সূরা থেকে অন্য সূরায় গমন করা যায়। বিভিন্ন আয়াত বের করা যায়, বিভিন্ন শব্দ দিয়েও আয়াত বের করা যায়। এ ছাড়া ইসলাম বিষয়ক অসংখ্য ওয়েবসাইট মানুষের জ্ঞানপিপাসা নিবারণে কাজ করেছে। অনেক সময় পড়া ও শোনার চেয়ে চোখে দেখা বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে ইউটিউব, ফেসবুক লাইভ অনেক বড় ভূমিকা রাখছে। শিশুদের জন্য ইসলামিক কার্টুনও বিশেষ ভূমিকা রাখছে শিশুমনে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের বিস্তারে। অস্বীকারের সুযোগ নেই, তথ্য ও প্রযুক্তি মানুষের জীবন-মানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। মানুষের জীবনপ্রবাহকে বেগবান করেছে। আর ইসলাম মানুষের জন্য যেকোনো কল্যাণকর জিনিসের সঠিক ব্যবহার অনুমোদন করে। তাই তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে ইসলামের কোনো আপত্তি নেই। কিছু ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ভুল ব্যবহার হচ্ছে। কোনো জিনিসের ভুল ব্যবহার হলে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। বরং ভুল ব্যবহার বন্ধ করতে হয় এবং সঠিক ব্যবহারে প্রসার করতে হয়। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার ও সহজলভ্যতা প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধের মাত্রাও বেড়েছে। উন্মুক্ত হয়েছে পাপের দরিয়ায় ডুব দেওয়ার বিশাল দুয়ার। শয়তান প্রতিনিয়ত মানুষকে ধোঁকা দিয়ে জাহান্নামে টেনে নেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত। অনেক হুঁশিয়ার ও সাবধান থাকতে হবে সবাইকে। অন্যথায় জ্ঞানার্জনের এ মাধ্যম হতে পারে পাপের অগ্নিকুণ্ড।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,
عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।” (সূরা নূর : ১৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

“সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।”(সূরা ক্বাফ/আয়াত ১৮)

আধুনিক মাধ্যমকে ইতিবাচক কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে যেন নিজেদের পার্থিব ও পরকালীন জীবন সুন্দর করতে পারি, আল্লাহর কাছে সে তওফিক প্রার্থনা করতে হবে সবসময়।

৫.১ ব্যক্তিগত জীবনে প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব:

টেলিভিশন : ব্যক্তিগত জীবনে টেলিভিশনের প্রভাব ১৯৪০ সাল থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে টেলিভিশন চালু হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। শুরুতে এর প্রভাব ছিল সীমিত, তবে ১৯৫০-এর দশক থেকে এটি সাধারণ মানুষের জীবনে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। বিশ্ব ঘটনাবলী থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত বিনোদন এবং শিক্ষামূলক বিষয় পর্যন্ত সবকিছু টেলিভিশনের মাধ্যমে মানুষের ঘরে পৌঁছাতে শুরু করে। এর অবাধ ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকেই এর নেতিবাচক প্রভাবও পরিলক্ষিত হতে থাকে।

এই প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থূলতা, ভাষা বিকাশে বিলম্ব, এবং শেখার অক্ষমতা, যা টেলিভিশন দেখার সময় শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা এবং অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে ঘটে।

স্থূলতা: দীর্ঘক্ষণ টিভি দেখার কারণে শারীরিক কার্যকলাপ কমে যায় এবং এটি অতিরিক্ত খাওয়ার দিকে পরিচালিত করে, যা স্থূলতার কারণ হতে পারে।

ভাষা ও শেখার অক্ষমতা: অল্প বয়স থেকেই টিভি দেখা শিশুদের ভাষা বিকাশে বিলম্ব এবং শেখার ক্ষমতার উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

মানসিক প্রভাব: এটি মানুষকে অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং একাকীত্ব বা বিচ্ছিন্নতার কারণ হতে পারে।

চারিত্রিক বিপর্যয়: টেলিভিশনে অবাধে নাটক, সিনেমা এবং বিভিন্ন অশ্লীল অনুষ্ঠান প্রচারের ফলে মানুষ তা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, যা খুব দ্রুত চারিত্রিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে।

ডিশ এন্টেনা: টেলিভিশনের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে ডিশ অ্যান্টেনা, যা সাধারণত স্যাটেলাইট ডিশ নামে পরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে ডিশ অ্যান্টেনা প্রযুক্তির প্রভাব মূলত ১৯৯০-এর দশক থেকে শুরু হয়। এই দশকে ডিশ অ্যান্টেনা ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হতে শুরু করে, কারণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন চ্যানেলের প্রোগ্রাম দেখা সম্ভব হয়, যা আগে সম্ভব ছিল না।

২০০০-এর দশকের শুরুতে এর ব্যবহার অনেক বাড়ে এবং এটি তথ্যপ্রযুক্তি ও বিনোদনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

২০০০-এর দশক, এই দশকে ডিশ অ্যান্টেনার ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে এবং এটি টেলিভিশন দেখার প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে তথ্যের প্রবেশাধিকার ও বিনোদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। সেই সময়ে যার টেলিভিশনে ডিস সংযোগ ছিল না তাকে অনেক ক্ষেত্রে সামাজিকভাবেও হেয় করা হতো, আনস্মার্ট মনে করা হতো। এই প্রযুক্তি আসার পর থেকেই মানুষের জীবন খুব দ্রুত অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়েছে। কারণ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত তাদের সংস্কৃতি এবং এর কুপ্রভাব মানুষের জীবনে বিস্তার লাভ করেছে। মানুষের যখন যা দেখতে মন চায়, তখনই তা দেখা সম্ভব এই প্রযুক্তিতে।

মোবাইল: বর্তমানে সর্বপ্রথম মোবাইল নামক প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাবের কথা চলে আসে। মোবাইল সিম কোম্পানীগুলোর লোভনীয় অফার ও এসবের অপব্যবহার তরুণ সমাজকে ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা ভুলেই যাচ্ছে পরকালে এসব কথা ও কাজের হিসাব হবে এবং এসবের রেকর্ড থাকবে। আল্লাহ বলেন, رَقِيبٌ عَتِيدٌ - 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে' (কাফ/আয়াত ১৮)।

শুধু তরুণ সমাজই নয় এখন তো শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত, সাধারণ মানুষ থেকে আলেম সমাজ পর্যন্ত এর ফাঁদে সবাই পড়ে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে এমন অবস্থা হয়েছে যে, এই স্মার্টফোন প্রযুক্তির সোনালী ফাঁদে পড়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, মা বাবার সাথে সন্তানের - সন্তানের সাথে মা বাবার কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই। সব পরিবারে না হলেও বেশিরভাগ পরিবারেই এখন এই চিত্র দেখা যায়।

৫.২ সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব

প্রযুক্তির কিছু সামাজিক নেতিবাচক প্রভাব হলো বিষণ্ণতা, একাকীত্ব ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি, সাইবার বুলিং, এবং ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা হ্রাস। অতিরিক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা বাড়ে এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া কমে যায়, যা একাকীত্ব ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে। এ ছাড়াও, প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে সাইবার ক্রাইম ও ডিজিটাল বিভাজন (ডিজিটাল ডিভাইড) এর মতো সমস্যা তৈরি হয়।

গোপনীয়তা লঙ্ঘন: অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত তথ্য এবং ছবি শেয়ার করার কারণে গোপনীয়তা ঝুঁকির মুখে পড়ে। খ্যাতিনামা ব্যক্তি থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত অনেকেই এর শিকার হয়েছেন।

সাইবার অপরাধ: প্রযুক্তি ব্যবহার করে চুরি, প্রতারণা, এবং মিথ্যা তথ্য প্রচারের মতো অপরাধগুলো ঘটে থাকে।

অতিরিক্ত আসক্তি: মোবাইল এবং ইন্টারনেট প্রযুক্তির প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে, তাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: প্রযুক্তি ব্যবহার অনেক সময় বাস্তব জীবনে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়।

মিথ্যা তথ্য ও গুজব: প্রযুক্তির মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ও গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যা সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।

বৌদ্ধিক সম্পত্তি লঙ্ঘন: অন্যের অনুমতি ছাড়া সফটওয়্যার বা কপিরাইটযুক্ত সামগ্রী ব্যবহার করা বা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া একটি বড় নৈতিক অপরাধ।

অন্যের সম্পদ ব্যবহার: অনুমতি ছাড়া অন্যের কম্পিউটার রিসোর্স বা ডেটা ব্যবহার করাও একটি অনৈতিক কাজ।

৫.৩ শিশু ও কিশোরদের ওপর প্রভাব

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ও জাতীয় কর্ণধার। বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন শিশু কিশোরদের উপকৃত করছে, তেমনি এর যথেষ্ট অবাধ ব্যবহার তাদের ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছে।

আমি মনে করি,শিশু ও কিশোরদের উপর প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি।এই প্রভাবের মধ্যে রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা (যেমন বিষণ্ণতা, উদ্বেগ), শারীরিক সমস্যা (যেমন চোখের সমস্যা, ঘুমের ব্যাঘাত), সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, এবং পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগ। অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম, ডিজিটাল আসক্তি এবং সাইবার বুলিং-এর মতো বিষয়গুলো তাদের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা

- **আসক্তি:** আমাদের শিশু কিশোরদের সিংহভাগ বর্তমানে ইন্টারনেট কিংবা বিভিন্ন অনলাইন গেমেরে নিমগ্ন থাকছে। ভারুয়াল গেম ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি শিশুদের মধ্যে রাগ, মানসিক চাপ ও আক্রমণাত্মক আচরণ বাড়াতে পারে।
- **উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা:** প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে উদ্বেগ, বিষণ্ণতা ও একাকীত্ব বাড়তে পারে।
- **জ্ঞানীয় বিকাশে বাধা:** প্রযুক্তি-নির্ভরতা সমস্যা সমাধানের দক্ষতা কমিয়ে দিতে পারে এবং সরাসরি সমবয়সীদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ কমিয়ে জ্ঞানীয় ও সামাজিক বিকাশকে ব্যাহত করে।
- **চারিত্রিক বিপর্যয়:**একটি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, একটি বেসরকারী সংস্থার এক জরিপের তথ্য অনুযায়ী ঢাকার স্কুলগামী শিশুদের প্রায় ৭৭ শতাংশ নিয়মিত পর্নোগ্রাফি দেখছে। (দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ১১)-- এটা কত ভয়ংকর একটা তথ্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য,তা বলার অপেক্ষা রাখে না।স্মার্টফোন এবং ইন্টারনেট হাতের মুঠোয় থাকায় সহজেই পর্নো ভিডিওসহ অশ্লীল ও অনৈতিক ভিডিও দেখার সুযোগ অনায়াসেই পেয়ে যায় অপরিণত বয়সিরা। আর এসব শিশু-কিশোরই একটু বড় হলে জড়িয়ে যাচ্ছে নানা অপকর্মে। দলবেঁধে আড্ডা দেওয়া, মাদকদ্রব্য গ্রহণ, মেয়েদের উত্তক্ত করা সহ নানা অপরাধমূলক কাজে সম্পৃক্ত হচ্ছে তারা। পরিবারের অসচেতনতার কারণেই কিশোররা বখাটে হয়ে যাচ্ছে। অপরিণত বয়সে মোবাইল ফোন

ব্যবহার বাধা না দেওয়ায় দিন দিন মোবাইল ব্যবহারে আসক্ত হয়ে পড়েছে তারা। লেখাপড়া থেকেও দূরে সরে যাচ্ছে। সন্ধ্যার পর বাজারে, রাস্তার মোড়ে আড্ডা দেওয়া এবং গ্রামপাড়া মহল্লায় তৈরি হচ্ছে তাদের একাধিক গ্রুপ। বড়দের সঙ্গে বেয়াদবি, শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন করতেও দ্বিধা করে না উঠতি বয়সিদের একটা শ্রেণি। আধিপত্য নিয়েও পরস্পরকে বিরোধে জড়াতে দেখা যায়।

- মোবাইল ফোনের অপপ্রয়োগ উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে এমনকি শিক্ষার্থীরা বখাটেপনায় জড়াচ্ছে। মোবাইলে গেম খেলতে গিয়ে তারা সন্ত্রাসীদের কিছু ভাষা বা অপরাধীদের ভাষা মনের অজান্তে মস্তিকে ধারণ করছে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করছে। এভাবেই ধীরে ধীরে বখাটেপনা ও অপরাধ জগতে প্রবেশ করছে। মোবাইল আসক্ত উঠতি বয়সিরা আসক্তির চরম পর্যায়ে মোবাইলের এমবি/টাকা জোগাতে পরিবারের নিকট টাকা বা মূল্যবান জিনিস চুরি করতেও পিছপা হচ্ছে না।

শারীরিক সমস্যা

- চোখের সমস্যা: দীর্ঘ সময় ধরে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে চোখের সমস্যা দেখা দেয়।
- ঘুমের ব্যাঘাত: প্রযুক্তির ব্যবহার ঘুমের স্বাভাবিক চক্রকে ব্যাহত করতে পারে।
- শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা: দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকার কারণে স্থূলতা ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।
- অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি: অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের ফলে ব্রেইন টিউমার ও ডিএনএ-এর পরিবর্তনের মতো ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলে কিছু গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সামাজিক ও আচরণগত সমস্যা

- সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: প্রযুক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা শিশুদের সরাসরি সামাজিক যোগাযোগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

- **সামাজিক সংকেত বুঝতে অসুবিধা:** শিশুরা সামাজিক সংকেত, যেমন মুখের অভিব্যক্তি বা শারীরিক ভাষা, বুঝতে কম পারদর্শী হতে পারে।
- **সাইবার বুলিং ও হয়রানি:** সাইবার জগতে ভুল তথ্যের বিস্তার এবং সাইবার বুলিং-এর কারণে শিশুরা মানসিক চাপে থাকে এবং তাদের আচরণে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
- **নৈতিক অবক্ষয়:** প্রযুক্তির অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার শিশুদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে।

পড়াশোনার উপর প্রভাব

অনাগ্রহ: অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

মনোযোগে ঘাটতি: এটি শিশুদের মনোযোগের ঘাটতি এবং পড়াশোনায় অনাগ্রহ তৈরি করতে পারে।

পরীক্ষার উদ্বেগ: ইন্টারনেট আসক্তি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষার বিষয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ তৈরি করে। এর আসক্তির কারণে সময় মতো পড়ালেখা না করার ফলে এই উদ্বেগ তৈরি হয়।

টোপামিন রিলিজ হওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব: বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, কার্টুন দেখার ফলে শিশুদের ব্রেইন থেকে টোপামিন নামক একটা পদার্থ রিলিজ হয়। এটা যখন রিলিজ হওয়া শুরু করে তখন শিশু যেসব কাজে টোপামিন রিলিজ হয়, শুধুমাত্র সেইসব কাজই করতে থাকে। আর সবচেয়ে উদ্বেগের কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে যত খারাপ খারাপ কাজ আছে, সেসব কাজ করলেই ব্রেইন থেকে হাই টোপামিন রিলিজ হয়। অর্থাৎ শিশু যত বড় হতে থাকবে, তার খারাপ কাজ করার প্রবণতা ততই বাড়তে থাকবে। নেদারল্যান্ড এবং চায়নার কয়েকটা বিজ্ঞানাগারে কয়েক হাজার স্টুডেন্টদের উপরে EEG পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যে বাচ্চারা কার্টুন দেখে তাদের ব্রেইনের একটা সেল(যার নাম নিউরন) তার গঠন পরিবর্তন হয়ে গেছে, যত খারাপ কোষ সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে, ব্রেইন ক্যান্সার, ব্রেইন টিউমারের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

৫.৪ অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ও মানসিক সমস্যা

একুশ শতক হচ্ছে প্রযুক্তির স্বর্ণযুগ। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি ছাড়া নিজেকে চিন্তা করাও অসম্ভব। ঘুম থেকে জেগে ওঠা থেকে শুরু করে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত, এমনকি ঘুমানোর সময় পর্যন্তও বেশিরভাগ মানুষ বিরতিহীন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

বিজ্ঞানের অবদানে দিন দিন উন্নত হচ্ছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তির বলে আজ মানুষের হাতের মুঠোয় সারা বিশ্ব। উন্নত বিশ্বের ধারাবাহিকতায় পিছিয়ে নেই আমরাও। আমাদের হাতের নাগালেই আজ মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটার। আমরা অনেকে আবার এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতি খুব বেশি আসক্ত। যারা খুব বেশি প্রযুক্তিতে আসক্ত, তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, অতিরিক্ত সব কিছুই খারাপ। খুব বেশি সময় এ প্রযুক্তি নিয়ে সময় ব্যয় করলে আমাদের শরীর ও মনে এর কিছু ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। আসুন জেনে নিই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যা

স্মার্টফোন, ট্যাবলেট কিংবা ল্যাপটপ এখন কর্মক্ষেত্রে কাজের পাশাপাশি ফ্যাশনের জন্যও প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এসবের অতিরিক্ত ব্যবহার শরীর ও মনের জন্য ক্ষতিকর। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, এসব যন্ত্রের অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষকে প্রযুক্তির দাস বানিয়ে দিচ্ছে। এতে মানুষ ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এসব প্রযুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আর এতে অনেকেই বিষন্নতাসহ অন্যান্য মানসিক রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। অন্যদিকে শারীরিক পরিশ্রম কমে যাওয়ায় সারাদিন বসে কাজ করার দরুন মুটিয়ে যাওয়াসহ শরীরে হাড় ও জয়েন্টের নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এছাড়া অতিরিক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের মস্তিষ্ক ও চোখের বিভিন্ন রোগেরও কারণ। সুইডেনের ইউনিভার্সিটি অব গুটেনবার্গের গবেষক সারা থমি বলেন, প্রযুক্তির সময় স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে এর স্বাস্থ্যকর ব্যবহার জানতে হবে। সারা থমি একদল গবেষক নিয়ে মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের ওপর গবেষণা চালান। দীর্ঘ ১ বছর গবেষণার পর দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত

সময় মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার ব্যবহার করেন, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সাধারণদের চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থায়। গবেষণায় দেখা গেছে, এদের অতিরিক্ত প্রযুক্তির ব্যবহারকারীদের মধ্যে তরুণদের সংখ্যাই বেশি এবং এদের বেশিরভাগই অনিদ্রাসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। সম্প্রতি ব্রাজিলের সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী গবেষণা শেষে জানিয়েছেন, মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় মানুষের রক্তচাপ ১২১/৭৭ থেকে বেড়ে গিয়ে ১২৯/৮২ হয়। তাই যারা দীর্ঘক্ষণ মোবাইল ফোনে কথা বলেন, তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত গবেষকরা গবেষণা শেষে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যারা একটানা দীর্ঘক্ষণ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করছেন, তাদের বেশিরভাগই শারীরিক ও মানসিক কোনো না কোনো সমস্যায় ভুগছেন।

অতিরিক্ত সময় প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে নেই আমরাও। তাই আমাদের দেশেও দিন দিন বেড়ে চলছে শারীরিক ও মানসিকভাবে আক্রান্ত বিভিন্ন রোগীর সংখ্যা। ঢাকার মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ফেইসবুক, ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে দিন দিন এ জাতীয় মানসিক রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে।

অধ্যায় ৬

প্রযুক্তি ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ ও সমাধান

৬.১: সচেতন ব্যবহার

প্রযুক্তির সচেতন ব্যবহার বলতে প্রযুক্তিকে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করাকে বোঝায়, যাতে এর থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যায় এবং কোনো ক্ষতি না হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তির ক্ষতিকর ব্যবহার এড়িয়ে চলা, যেমন - অপরিচিতদের ব্যক্তিগত তথ্য না দেওয়া, দীর্ঘ সময় ধরে প্রযুক্তি ব্যবহার না করা এবং সাইবার অপরাধ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা। সচেতনভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করলে তা শিক্ষা, যোগাযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো ক্ষেত্রে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে।

প্রযুক্তির সচেতন ব্যবহারের কিছু উপায়:

- **ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা:** অপরিচিত কাউকে ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- **অনলাইন নিরাপত্তা:** ইন্টারনেট বা অন্য কোনো প্রযুক্তি একা একা বা অন্যদের আড়ালে ব্যবহার করবেন না, বিশেষ করে যদি তা ব্যক্তিগত হয়।
- **ব্যবহারের সময়সীমা:** দীর্ঘ সময় ধরে প্রযুক্তি ব্যবহার না করে, সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করুন।
- **সতর্কতা:** প্রযুক্তি ব্যবহারের সময় যেকোনো ধরনের প্রতারণা, স্ক্যাম বা ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।
- **সঠিক ব্যবহার:** প্রযুক্তিকে কেবল মজার জন্য নয়, বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা বা যোগাযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহার করুন।
- **শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা:** প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা পরিহার করুন এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য অন্যান্য কাজেও মনোযোগ দিন।
- **আইন সম্পর্কে জানা:** প্রযুক্তি সম্পর্কিত আইন সম্পর্কে সচেতন হন এবং তার অপব্যবহার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলুন।

৬.২ নৈতিক দিকনির্দেশনা

নৈতিকতা হলো মানুষের আচরণ ও কাজের পেছনে থাকা সঠিক ও ভুলের ধারণা। এটি আমাদেরকে সঠিক পথে চলতে এবং সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বসবাস করতে সাহায্য করে। প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা মানে হলো এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করার সময় আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী কাজ করা। অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা, ভুল তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকা, এবং সাইবার বুলিং এড়িয়ে চলা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। এক কথায়, ICT ব্যবহারে নৈতিকতা মানে হলো প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করার পাশাপাশি অন্যদের ক্ষতি না করা।

১৯৯২ সালে Computer Ethics Institute কম্পিউটার নৈতিকতা বিষয়ক দশটি নির্দেশনা উপস্থাপন করে -

- অন্যের কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ব্যবহার না করা।
- অন্য ব্যক্তির কোনো কম্পিউটার কাজের উপর হস্তক্ষেপ না করা।
- অন্য কারো কম্পিউটার হতে ফাইল বা কোনো তথ্য সংগ্রহ না করা।
- চুরির উদ্দেশ্যে কারো কম্পিউটার ব্যবহার না করা।
- মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ বহনের কাজে কম্পিউটার ব্যবহার না করা।
- যেসব সফটওয়্যারের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়নি, সেগুলো অনুমতি ছাড়া ব্যবহার না করা।
- বিনা অনুমতিতে অন্য কারো কম্পিউটার রিসোর্স ব্যবহার না করা।
- অন্য কারো বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ফলাফল আত্মসাৎ না করা।
- কোনো প্রোগ্রাম রচনা বা সিস্টেম তৈরির ক্ষেত্রে সেটির সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা।
- কম্পিউটারকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে করে পারস্পরিক সদ্ভাব ও শ্রদ্ধা বজায় থাকে।

৬.৩ পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। পরিবারকে প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন

হতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট নিয়মকানুন তৈরি করতে হবে, যেখানে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সময় কাটানো এবং একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অন্যদিকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে হবে, একটি স্বাস্থ্যকর ডিজিটাল পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নৈতিকতাও শেখাতে হবে।

পরিবারের ভূমিকা

- **নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনা:** পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করতে হবে। যেমন, খাবার টেবিলে মোবাইল ব্যবহার না করা বা রাতে নির্দিষ্ট সময়ের পর ডিভাইস ব্যবহার বন্ধ রাখা।
- **গুণগত সময় কাটানো:** পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নিয়মিতভাবে কথা বলা, খেলাধুলা করা এবং একসঙ্গে সময় কাটানোর মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। এতে প্রযুক্তির প্রতি আসক্তি কমে আসবে।
- **সচেতনতা বৃদ্ধি:** প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সন্তানদের জানাতে হবে এবং একটি সুস্থ ডিজিটাল জীবনযাপন পদ্ধতি শেখাতে হবে।
- **সঠিক উদাহরণ স্থাপন:** বাবা-মা হিসেবে নিজেরা প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে বিরত থেকে একটি ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

- **শিক্ষামূলক পাঠ্যক্রম:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সঠিক ব্যবহার শেখানো এবং এর অপব্যবহারের কুফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা উচিত।
- **ডিজিটাল পরিবেশ তৈরি:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সুস্থ ডিজিটাল পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিকে শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার করতে পারবে।

- নৈতিকতা ও সুরক্ষার শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের অনলাইন নিরাপত্তা, তথ্য গোপনীয়তা এবং সাইবার বুলিংয়ের মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া জরুরি।
- প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতি: মাল্টিমিডিয়া, প্রজেক্টর এবং ই-বুকের মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাঠদানকে আরও আকর্ষণীয় এবং কার্যকর করা যেতে পারে।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং সম্মানের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا ۚ وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

অর্থাৎ: “হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোষ্ঠ খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।” (সূরা হুযুরাত /আয়াত ১২)

এই আয়াত আমাদের অন্যদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে চর্চা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশনা দেয়।

হাদিসেও প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করে, আল্লাহ তার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।"

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। কোনো ব্যক্তির ছবি, ব্যক্তিগত তথ্য, বা বার্তা শেয়ার করার আগে অবশ্যই তার অনুমতি নেওয়া উচিত। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে অন্যের গোপনীয়তার প্রতি সম্মান দেখানো ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিহার্য।

মিথ্যা এড়ানো

ইসলামে সত্য কথা বলা এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআন এবং হাদিসে স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, কারণ এটি শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং সমাজের ন্যায় এবং শান্তির জন্যও ক্ষতিকর। কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা থেকে দূরে থাকতে আদেশ দিয়েছেন। যেমন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থাৎ: “হে মুমিনগণ,তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।” (সূরা আত-তাওবা আয়াত/ ১১৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ

“আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।”

আজকের ডিজিটাল যুগে সোশ্যাল মিডিয়া, ব্লগ, এবং অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো দ্রুত এবং সহজ হয়ে উঠেছে। ইসলাম এই ধরনের আচরণকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কোনো তথ্য শেয়ার করার আগে অবশ্যই তার সত্যতা যাচাই করা উচিত। অনলাইনে মিথ্যা কথা প্রচার করা যেমন সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি এটি ইসলামী নীতির বিরুদ্ধেও।

সময়ের সদ্যবহার

ইসলামে সময়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, এবং এটি সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মানুষের জীবনে সময় এক অমূল্য সম্পদ, যা একবার চলে গেলে ফেরত আসে না। তাই ইসলামে সময়ের সদ্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

কুরআন শারিফে আল্লাহ বলেছেন,

وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)

অর্থ:- “সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।”(সূরা আছর)

এখানে আল্লাহ মানুষের ক্ষতির কারণ হিসেবে সময়ের অপব্যবহারকে চিহ্নিত করেছেন এবং সময়কে সৎকাজ, সত্য প্রচার, এবং ধৈর্যের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করার উপর জোর দিয়েছেন।

আজকের যুগে, ডিজিটাল মাধ্যমগুলি আমাদের সময়ের বড় একটি অংশ গ্রাস করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অনলাইন গেম, এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি প্রায়ই সময়ের অপচয় ঘটায়। ইসলাম আমাদের সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর নির্দেশনা দেয়, যেমন শিক্ষা অর্জন, কাজ করা, এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন। অতিরিক্ত সময় কাটানো, বিশেষত ডিজিটাল মাধ্যমের মাধ্যমে, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করতে পারে।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার:

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শুধু একটি আধুনিক চ্যালেঞ্জ নয়, বরং এটি ইসলামের নীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে প্রযুক্তি বা যেকোনো ধরনের উপকরণের ব্যবহার মানুষের উপকারে আসতে হবে, এবং তা যেন ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য, যেমন নৈতিকতা, শান্তি, ও সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী না হয়।

প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ইসলাম সমর্থন করে বিশেষত যখন এটি মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন, শিক্ষা বা গবেষণার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার, স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও চিকিৎসা প্রযুক্তির ব্যবহার, এবং সমাজে সেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্মগুলো গঠন করা। ইসলাম প্রযুক্তির ব্যবহারকে শুধু নিষিদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করে না, বরং এটি উৎসাহিত করে যখন তা মানবতার উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায় ৭

উপসংহার ও সুপারিশ

৭.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আসমান-যমীন, আগুন-পানি, মাটি, বাতাস ইত্যাদি ছাড়াও লাখ লাখ মাখলুক। দুনিয়াতে যা কিছু আমরা মানুষের আবিষ্কার বলে মনে করি, সেগুলোও মূলতঃ আল্লাহ তা‘আলারই সৃষ্টি। কারণ তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনিই কালের স্রষ্টা, কালের সব নবাবিষ্কারও তাঁরই সৃষ্টির সহায়তায় সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন, *هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا* ‘তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু’ (সূরা বাক্বারাহ /আয়াত আয়াত২৯)। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে যত সব আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি।

ইসলামিক নীতিগুলি আমাদের জীবনযাপন এবং আচরণে ভারসাম্য রক্ষা করার কথা বলে, যা ডিজিটাল যুগেও প্রযোজ্য। কুরআন ও হাদিসে যেমন বলা হয়েছে -- খাবার, পানীয়, এবং আচরণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ততা এড়ানো উচিত, তেমনি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সঠিক এবং সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রযুক্তি নিজে কোনও খারাপ বিষয় নয়, তবে এর অতিরিক্ত ব্যবহার বা ভুল ব্যবহার আমাদের জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক, যেমন ইলম-আমল, পরিবার এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

ইসলাম আমাদের ডিজিটাল মাধ্যমেও সময়ের সঠিক ব্যবহার এবং নৈতিক আচরণের প্রতি মনোযোগ দিতে বলে। প্রযুক্তির সদ্যবহার নিশ্চিত করলে এটি আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উন্নতিতে সহায়ক হতে পারে। আমাদের উচিত কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত নীতিগুলি অনুসরণ করে ডিজিটাল দুনিয়ায় ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করা, যাতে তা আমাদের ইলম ও আমল, পারিবারিক সম্পর্ক এবং সমাজের কল্যাণে উপকারী হয়।

আল্লাহর দেয়া অন্যান্য নেয়ামতের মতো, প্রযুক্তির কল্যাণকর দিকগুলোর জন্যও শুরিয়া আদায় করা প্রতিটি বান্দার জন্য আবশ্যিক। কেননা আল্লাহ্ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য নেয়ামত বাড়িয়ে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।’ (সূরা ইবরাহিম : ৭)

শয়তান মুসলিমদেরকেই ধোঁকা দিতে সব সময় ব্যস্ত থাকে। তাই বিভিন্ন প্রযুক্তির ভালো দিকগুলো বাদ দিয়ে খারাপ দিকগুলোতেই মুসলিমরা বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েছে। তারা তাদের অতীত ভুলে গিয়ে ফাহেশা কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকে। তাই প্রয়োজনীয় ইলম অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে এবং সবকিছু থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে ইসলামের শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে গেছে এবং এটাই প্রচার করে যাচ্ছে যে মুসলিমরা পিছিয়ে গেছে শুধুমাত্র আধুনিকতা এবং প্রযুক্তিকে এড়িয়ে যাওয়ার কারণে। অথচ অতীত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আধুনিকতা ও বিজ্ঞানে মুসলিমরাই আগে এগিয়ে ছিল। অনেক প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি মুসলিম বিজ্ঞানীরাই আবিষ্কার করেছেন। এখন মুসলিমরা যত দীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ততই তারা বিধর্মীদের অনুগত হয়ে যাচ্ছে। তারা যেভাবে বলে সেভাবেই চলতে পছন্দ করে। একটি সাহসী জাতির যে স্বাধীন নির্বাচন-শক্তি থাকা অপরিহার্য এখনকার মুসলমানরা তার পরিচয় দিতে পারে না। তাই পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের অকল্যাণকর জীবন-দর্শনও মুসলিমরা গ্রহণ করে ফেলেছে। কিন্তু এটা বুঝতে পারছে না যে, ধীরে ধীরে তারা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে কুরআন-হাদিস অনুযায়ী সঠিক জ্ঞানার্জন করা এবং সেই অনুযায়ী চলা।

হাদীসেও জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন- আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ “যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) অর্জন করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন।”

আল-কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা যে সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা অনুধাবনের জন্যও জ্ঞানী হওয়া প্রয়োজন। ইরশাদ হয়েছে:

“وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ” “আর এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য পেশ করি আর জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া কেউ তা বুঝে না।” (আল - আনকাবুত/আয়াত -৪৩)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আকল বা বিচার-বুদ্ধি ও ফিকর বা চিন্তা-চেতনার গুরুত্ব অত্যধিক। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের নির্দেশনা এসেছে যে,

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ

তবে কি তারা নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনি? আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে এবং এর মাঝে বিদ্যমান জিনিসকে যথাযথ উদ্দেশ্য ও নির্দিষ্ট মেয়াদ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেননি। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই নিজ প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করে। (সূরা আর রুম/আয়াত ৮)

আমরা যদি এই আয়াতের উপর ফিকির করি, তাহলে বিভিন্ন প্রযুক্তি হয়ে যাবে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত। কারণ প্রত্যেকটা জিনিসেরই ভালো এবং খারাপ উভয়দিকে আছে। সেরকম ভাবেই বিভিন্ন প্রযুক্তিকেও আমরা খারাপ এবং ভালো দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে পারি। যারা আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পাবে, তারা অবশ্যই আল্লাহর কোন নেয়ামতকে খারাপ কাজে ব্যবহার করবেন না।

৭.২ মূল সিদ্ধান্ত

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রযুক্তিরও পরিবর্তন ঘটছে এবং আরও উন্নত হচ্ছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, এইসব উন্নত প্রযুক্তিকে মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অনৈতিক এবং ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করছে। একমাত্র ধর্মীয় প্রভাব থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে মুসলমানরা বিভিন্ন ফাহেশা কাজে সময় নষ্ট করছে। ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে।

আর ইসলাম হচ্ছে একমাত্র সেই ধর্ম, যা মানুষকে সঠিক ও সুন্দর পথে পরিচালিত করে। জাতি ও সমাজকে অশ্লীলতা ও তার কুফল থেকে রক্ষা করতে হলে ঈমান ও তাকওয়া; বিশ্বাস ও খোদাভীতির চর্চার কোনো বিকল্প নেই। চিন্তা-চেতনায়, বিশ্বাস ও কর্মে ইসলামী শিক্ষা ও জীবনধারা অনুসরণের দাওয়াতই আল্লাহর ইচ্ছায়- ব্যক্তি ও সমাজকে আত্মসংযমের পথে নিয়ে আসতে পারে।

ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। একজন মুমিন বান্দা কখনই আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি,পরিবার,সমাজ সর্বোপরি একটি রাষ্ট্র যদি আল্লাহর দেওয়া বিধান মতো পরিচালিত হয়, তাহলেই মানব জাতি বর্তমান প্রযুক্তির এই ভয়াবহ ফাঁদ থেকে মুক্ত হতে পারবে,ইনশাআল্লাহ্।

মুমিন বান্দারা কখনো ধোঁকা দেয় না এবং কারো কাছ থেকে ধোঁকা খায়ও না। প্রযুক্তির ফাঁদ হচ্ছে শয়তানের একটা অন্যতম ধোঁকা।একজন মুমিন বান্দা তাই সবসময় সচেতন থাকবে,এই ধোঁকার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। নিজের টাকা খরচ করে একজন সচেতন মানুষ কখনোই প্রযুক্তির গোলাম হয়ে এর ফাঁদে পড়তে পারে না।

পবিত্র আল-কুরআনের সূরা আন-নাহল এর ১২৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্ম করে।” সুতরাং সমস্ত ফাহেশা কাজ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে পরহেযগারি অবলম্বন করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তথ্যসূত্র:

*কুরআনের আয়াত,

* হাদিস

* ইন্টারনেট

* বিভিন্ন লেকচার

* বিভিন্ন পত্রিকা --" আত-তাহরীক",

"মাসিক আল কাউসার"

"সময়ের আলো"(আরিফ খান সাদ)

"আলোকিত বাংলাদেশ"(মহসীন কবির

জনস্বাস্থ্যবিষয়ক লেখক ও গবেষক

ইনচার্জ, ইনস্টিটিউট অব জেরিয়েট্রিক মেডিসিন)

* 'শিক্ষক বাতায়ন'

* "Health journal"

* "Satt Academy"

* IslamOnWeb (Jakir Hossain)